স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস ‘স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক’ ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির শেষ পর্ব আজ রবিবার, মে ০৮, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

১০ম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৭১-

ভাঙ্গছে! বরফের পাহাড় ভাঙ্গছে। গ্রীষ্মের আগমনে বরফ গলছে। বরফের পাহাড় কত বড় হতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। তাও আবার পানির উপর। পানি বরফ হয়, তার উপর স্নো পড়তে পড়তে পাহাড় হয়। সেই পাহাড় গ্রীষ্মে যখন ধ্বসে পড়ে তখন এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। নদীর পানি বরফ হয়, তার উপর দিয়ে মানুষ চলাচল করে। গ্রীষ্মের আগমনে তা গলে আবার পানি হয়। তখন থেকেই শুরু হয় পিকনিক মানে বনভোজন। সব দেশের মানুষ পুরো গ্রীষ্মটা ব্যস্ত থাকে আনন্দে। প্রতিটি পার্ক ভর্তি থাকে মানুষ। বাঙালীও পিছিয়ে নেই। প্রায় সব সংগঠন থেকেই ঘটা করে পিকনিক করে। পিকনিক করতে গিয়ে কোন কিছু নিয়ে লেগে যায়। সংগঠন ভাংগার কারণ দাঁড়ায়। ঘুণে ধরে, পরবর্তীতে ভাঙ্গে।

ভাঙ্গছে। সংগঠন ভাঙ্গছে। ক্ষমতার কেন্দ্র ভাঙ্গছে। বাংলাদেশ সোসাইটি ভাঙ্গছে। ফোবানা ভেঙ্গে এখন তিনটা হয়েছে। সব ভাঙ্গছে। সাংস্কৃতিক সংগঠন, ক্রীড়া সংগঠন,আঞ্চলিক সংগঠন ভাঙ্গছে। পূজা সমিটি তিনটা হয়েছে। কারণ ক্ষমতা। ক্ষমতার লোভ। আর এই লোভি মানুষগুলো সমাজের উচ্চশিক্ষিত বলে দাবীদার। তাদের অনেকের নামের আগে ডক্টর উপাধি আছে। এই উপাধি মিথ্যে নয়। ১৯৭৫এর পর থেকে যেসব যুবক এদেশের মাটিতে পা রেখেছে তাদের বেশিরভাগই লেখাপড়া করেছে। তারা পি এইচ ডি করেছে অনেকে। তারা কোন্ বিষয়ে পি এইচ ডি করেছে তা জানা যায় না। তবে তাদের কাজকর্ম দেখে মনে হয় সংগঠন ভাঙায় তারা পি এই ডি করেছে। কেউ

আছে এসব সংগঠনের ধারে কাছেও উঁকি দিয়ে দেখেন না। তাদের সংখ্যাই বেশি।

এই ভাঙ্গার খেলায় প্রধান ভূমিকা পালন করে এখানকার স্থানীয় বাংলা পত্রিকাগুলো। এই ডাক্তাররা তাদের নাম এবং ছবি ছাপানোর জন্য এই পত্রিকাগুলোর সাথে যোগ দিয়ে সংগঠন ভাঙ্গায় মেতে উঠে। নিজেরা ক্ষমতা দখল করে, নাম জাহির করে। আর পত্রিকাগুলোর লাভ হয় বিজ্ঞাপন দিয়ে। যেখানে একটা সংগঠণ সেখানে একটা বিজ্ঞাপন আসে। একটাকে ভেঙ্গে তিনটা করতে পারলে তিনটা বিজ্ঞাপন আসে। এই হিসেব করে তারা ভাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়ে ভাঙ্গতে সাহায্য করে। এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলকে লেলিয়ে দিয়ে দু'দিকের খবরই ছাপে। দু'দিক থেকেই বিজ্ঞাপন আসে।

আনিসের মন ভাঙছে। কোন কিছুতেই আর মন বসেনা। অফিস থেকে এখন আর ঘরে ফিরতে মন চায় না। কোন আকর্ষন নেই। লতা ভাবি আসবে না। ঘরে গেলেই মনটা এলোমেলো হয়ে যায়। কি যেন নেই, কিছুই যেন নেই। সব হাহাকার। তার ঘর দেখলে মনে হবে সত্যিই এখানে বেচেলর থাকে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে যেখানে সেখানে। মনে হয় তার এসব আর প্রয়োজন নেই। সে কোন দিন চলে যায় বাহারের বাসায়, কোনদিন আমানের বাসায়। আমানের বাচ্চাগুলোর সাথে তার ভাব হয়ে গেছে। সেখানে ওদের সাথে খেলে। শান্তর কথা মনে পড়ে। সাথে সাথে মনটা বিষিয়ে যায়। লতা তাকে লতার মত আকড়ে আছে যেন। দিন রাত এখন একই ভাবনা। লতা কি সত্যিই আর আসবেন না? পারবে কি না এসে থাকতে? নিজকে অপরাধি মনে হয়। কেন লতাকে যেতে দিল! কেন বাধা দিল না? আবার ভাবে, অন্যের স্ত্রীকে সে কোন্ অধিকারে বাধা দেবে? লতা তার কে? কোন্ অধিকারে সে তাকে কাছে পেতে চায়? নিজেই নিজকে প্রবোধ দেয়। এই লতা চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে ঘরের বাইরে সময় কাটায়। কোন দিন আমানের ওখানেই খেয়ে আসে, কোন দিন বাহারের ওখানে। যেখানেই যায় মন জ্বলতেই থাকে। মনে মনে বলে, এবার ফিরে আসলেই হল। সাহস করে বলেই ফেলবে, তোমাকে ছাড়া আমার চলবেনা!

আনিসের এ অবস্থা বিন্দু খেয়াল করেছে। একদিন আনিসকে জিজ্ঞেস করল, তোমার আম্মা কবে আসছেন?

এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে তিনচার মাসের বেশি লাগবে না।

তোমার আম্মার ঠিকানাটা দাও। আমি একটা চিঠি লিখব। ওনাকে দিয়ে আমার কিছু জিনিষ আনাব।

ঠিক আছে, লিখুন।

ঠিকানা লেখা শেষ হলে জিজ্ঞেস করল, তোমার কথা কিছু লিখতে হবে?

না, আমার কথা আর কি লিখবেন? লতা ভাবীর কাছে তো চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

তুমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলে?

হ্যা, গিয়েছিলাম।

আমি ইচ্ছে করেই যাইনি। চোখের জল দেখতে পারব না, রাখতেও পারব না।

আপনাদের এ জিনিসটা বেশ ষ্টক আছে। যখন তখন ছাড়তে পারেন।

কিন্তু কোথাও ভিজানো যায় না।

ভিজলেও দেখা যায় না। আনিস বলল।

ঠিক আছে, আমার জিনিসটা আনানোর ব্যবস্থা করি।

বিন্দু কি জিনিস আনাবে আনিস জিজ্ঞেস করেনি।

সেদিন বাহারের বাসায় গিয়ে আনিস দেখে আর এক ভাঙনের সংকেত। শাহজাহান বাহারের সাথে কথা বলছে। বাহার বলছে, শাহজাহান, তুমি যে কাজ করেছ তা ক্ষমার অযোগ্য। আমি এ ব্যাপারে তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না। তোমার সাথে কথা বলতেই আমি ঘৃণাবোধ করি।

অপরাধ করলেই তো মানুষ ক্ষমা চায়। অপরাধ করেছি বলেই ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি এসব একদম বন্ধ করে দেব। আর খাব না।

শাহজাহান পান করে। শরাবন তহুরা নয়, এর কাছাকাছি হয়ত কিছু। এত বেশি পান করে যে তাকে নরমাল অবস্থায় পাওয়া যায় না। সব সময় পান করে। আমরা যাকে বলি মদ্য পান। তার পকেটেও থাকে বোতল। যখন তখন পান করে। ঘরে বাইরে। কাজের সময়ও। কিন্তু কাজ ঠিকভাবেই করে।

প্রবাসে মদ্যপদের তিনটা ভাগে ভাগ করা যায়। এক, লুকিয়ে পান করে। পরিবারের কেউ জানে না। তারা সীমিত থাকে। দুই, পরিবারের মানুষ জানে পান করে, তবে বেহুস হয় না বা পরিবারের সামনে পান করে না। তিন, তারা কাউকে পরোয়া করে না। যখন তখন যেখানে সেখানে মাতাল হতে কোন চিন্তা করে না। এই তিন নম্বর মদ্যপদের সন্তানরাও এক সময় পান করা শুরু করে মাতাপিতার চালচলন দেখে। এই তিন নম্বর মদ্যপের সংখ্যা বাঙালীর মাঝে খুব কম। শাহজাহান এই তিন নম্বরে।

তোমার মত এমন একটা বর্বর, জানোয়ার স্বামীর প্রয়োজন কি? মলিনা ভাবী ইচ্ছে করলে কি না করতে পারত? তিনি কিছুই করেননি। অমায়িক ভদ্রমহিলা। তুমি নিজের পরিবারটাকে নিজে নষ্ট করছ! তোমাকে তাদের কোন প্রয়োজন নেই! তোমাকে বের করে দিয়েছে ভাল করেছে। যাও,এখন বাইরে বাইরে ঘুর। আমার এখানেও আর এসো না। আমি তোমাকে দেখতে চাই না।

এখানে পানির দাম আর মদের দাম কাছাকাছি। শাহজাহানের বড় ছেলেটা এখন চৌদ্দ বছরের। খুব ভাল ছাত্র। মলিনা শাহজাহনকে অনেক দিন থেকে বলে আসছে, গিল যখন তখন বাইরে থেকে গিলে আসলেই হয়! বাচ্চাদের সামনে গিল কেন? ঘরে এসব চলবে না! কিন্তু কে শোনে কার কথা! শাহজাহান চালিয়েই যাচ্ছে।

একদিন বেহুস অবস্থায় বোতলটা টেবিলের উপর রেখেই ঘুমিয়ে গেল। মলিনাও খেয়াল করেনি। সকালে ছেলের হাতে দেখল বোতলটা। সে টেষ্ট করছে। এটা কেমন লাগে দেখছে। এর মাঝেই মলিনা দেখে ফেলেছে। তারপর কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে শাহজাহানের সাথে। কিন্তু শাহজাহান অটল, অপরিবর্তিত। সে ভুলে গেছে এটা আমেরিকা। বাঙালী ললনা অনেক কিছু করতে পারে। যা আমেরিকানরা করে না।

কোন কোন বাঙালীর কাছে মদ্যপান একটা বিরাট অপরাধ, যা ক্ষমার অযোগ্য। কারও কাছে ধর্মিয় অপরাধ। আর এ দেশে আমেরিকানরা মদ না হলে কোন অতিথি আপ্যায়নই হয় না। এটা তাদের কাছে সাধারণ একটা পানীয়র মত। অপরাধ নয়। মলিনা কয়েকদিন শাহজাহানকে সাবধান করে দেবার পরও যখন বন্ধ হয়নি, তখল বলল, তুমি আর ঘরে এসোনা। আমার সন্তানদের বাঁচাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত গতকাল পুলিশ কল করে পুলিশের হাতে দিয়েছে। আজ ছাড়া পেয়ে বাহারের কাছে এসেছে। নাকে খত দেবে। আর গিলবেনা।

তাহলে চল, মলিনা ভাবীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও আর প্রতিজ্ঞা কর। সন্তান তোমারও। তাদের মানুষ করার দায়ীত্ব দুজনের সমান। প্রয়োজনে নিজের সুখ ত্যাগ করতে হয়।

মাতাপিতার চালচলন ছেলেমেয়েদের চালিত করে। যেসব ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে তাদের মাতাপিতার কর্মের প্রতিফলণ দেখা যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে।

-৭২-

বাড়ীর ক্লোজিং হয়ে গেছে। ক্লোজিং টেবিলে চাচা চাচী দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। বাড়ীর চাবী আনিস নেয়নি। চাচাকে বলল, আপনি চাবি নিন। বাড়ীতে প্রথম আপনি আর চাচী ঢুকবেন। তারপর আমি।

সেখান থেকে বেরিয়ে সুসান বলল, চলতো, সামনে একটা গাড়ীর বড় ডিলার আছে। দেখে যাই তোমার শখের মার্সিডিস আছে কিনা। অন্তত রংটা পছন্দ করে রাখ।

ঠিক আছে। চলুন দেখি গাড়ীর দাম কি রকম।

এসব গাড়ীর ডিলারের সাথে স্যালসম্যান বেশিরভাগই এশিয়ান। একটা গাড়ী বিক্রি করলে ২ থেকে ৫% কমিশন। ক্রেতা আসলে যে কোন স্যালসম্যান এসে স্বাগত জানাতে পারবে না। তাদেরও একটা নিয়ম আছে। একটা লাইন আছে। রিসিপসনিষ্ট নাম ধরে ডাকবে এখন কোন্ স্যালসম্যান নবাগত কাষ্টমারকে সার্ভিস দেবে। আনিসরা যখন শো রুমে ঢুকল তখন রিসিপসনিষ্ট যার নাম ধরে ডাকলেন তিনি হলেন লোকমান হোসেন। একজন বাঙালী।

প্রথমেই মার্সিডিস দেখল। দাম সত্তর হাজার থেকে আশি হাজার। আনিস থমকে গেল। সুসান জিজ্ঞেস করল, কি হল বাবা? কথা বলছনা যে! খুব তো মার্সিডিস মার্সিডিস করছ। তখন কিছু বলিনি। কেনা তো সহজ। মেনটেইন করাটা সহজ নয়। এ গাড়ীর দাম যেমন বেশি পার্টসের দামও বেশি। তাছাড়া আয় বুঝে ব্যয় করতে শেখ। তোমার মাসিক বেতন কত? এই বেতনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তুমি মার্সিডিস কিনতে পার না। তোমার একটা ভাল গাড়ীর প্রয়োজন। মার্সিডিসই যে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কম দামের মধ্যে অনেক ভাল গাড়ী আছে। এই যেমন টয়োটা ক্যামরি। কম দামের মাঝে সবচেয়ে ভাল গাড়ী। তিরিশ হাজারের মধ্যেই হয়ে যাবে।

চাচাও সুসানের কথায় সায় দিলেন। এখন টয়োটা কিন ফেল। পরে যদি মনে কর মেনটেইন করতে পারবে তখন দেখা যাবে। গাড়ী তো যে কোন সময় কেনা যায়।

শেষ পর্যন্ত টয়োটা সাব্যস্ত হল। রংও পছন্দ করল সুসান। ক্রীম কালার। গাড়ী কিনলে টাকা না হলেও চলে। ডিলাররা শুধু গাড়ী গছিয়ে দিতে চায়। একবার গছাতে পারলে টাকা আদায় হবেই।

যে রংটা পছন্দ হল সেটা এখন ষ্টকে নেই। সাতদিন লাগবে। সুসান আনিসকে গিফট দিল পাঁচ হাজার ডলার। তাই ডাউন পেমেন্ট। সাত দিন পর গাড়ী পৌঁছে যাবে আনিসের নতুন বাড়ীতে।

রাতে চাচার বাসায় খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরল আনিস। কাপড় বদলে লুঙ্গিটা পড়া শেষ হয়েছে তখনি বেল বেজে উঠল। আব্বাস সাহবে গিয়ে দরজা খুলে দিল। কিছুক্ষন পর সেলাম দিয়ে উপস্থিত হল শরাফত চাচা। পানে একটা গাল ফুলে আছে। খুব খুশি খুশি ভাব। বিছানায় বসেই বলল, ভাতিজা একটা খুশির খবর আছে। পুড়িডা দেশে যাইতে রাজি হইছে। তার মা আর আমি মিলে বুজাইছি যে, দেশে কিছুদিনের

জন্য বেড়াতে যাব। এই মাস খানেক থাকব। আবার চলে আসব। আমাদের জায়গা জমি নিয়ে ঝামেলা। সব বিক্রি করে অনেক টাকা নিয়ে আবার ফেরত আসব। তখন এই টাকা তোমাদেরই হবে। পোলাডা কয় হের টাকার দরকার নাই। পুড়িডা রাজি অইছে যখন তখন তাড়াতাড়ি করতে অইব। কোন রকমে দেশে নিতে পারলেই অইল। টিকেটের টাকার জন্যই এখন ঝামেলাটা। হিসাব কইরা দেখলাম তিনজনের টিকেটের টাকা কোন মতেই যোগার করতে পারছিনা। এখন দেশে ভাতিজার কাছে লেখছি। টাকাটা পৌঁছলেই দেশে রওয়ানা দিব।

এমন সময় আব্বাস একটা সিগারেট ধরিয়ে লুঙ্গিটা পেঁচিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল। তাদের কথা শুনে বলল, চাচা, একটা কাজ করুন না কেন। অফ দা বুকে কাজ করুন। তাহলেই তো আপনাদের টিকেটের টাকা যোগার হয়ে যায়। দেশ থেকে টাকা আনার প্রয়োজন কি?

অফ দা বুক মানে নগদ টাকায় কোথায়ও কাজ করা। কাগজে পত্রে যার কোন রেকর্ড থাকবেনা। সরকার জানতে পারবে না কোন ইনকামের কথা। যারা সরকারী সাহায্যের উপর দিনাতিপাত করে তারা যদি কোথায়ও কাজ করে তাহলে যত টাকা আয় হয় তা বাদ দিয়ে বাকী টাকা সরকার দেবে। এখানে যাদের গ্রীন কার্ড আছে তাদের অনেকেই সরকারি সাহায্য গ্রহন করে এবং নগদ টাকায় জানাশোনা কোন জায়গায় কাজ করে। যারা কাজ দেয় তারাও জানে সরকারকে ফাঁকি দিচ্ছে, আর যারা কাজ দেয় তারাও সুযোগ নেয়। যেখানে একজন কর্মচারিকে দশ ডলার বেতন দিতে হয় সেখানে কেশে যারা কাজ করে তাদেরকে অর্ধেক দিলেও অনেকে কাজ করে। তারা যা পায় তাই লাভ।

আব্বাসের কথা শুনে শরাফত চাচা বলল, এইডা তো আগে কেউ কইলনা। এইডা তো বালা বুদ্ধি! কাজ পামু কই? কেডা দিব কাম?

সন্দীপ গ্রোসারীতে একটা লোক লাগবে। চলুন কাল আমি বলে দিব।

কয়ডার সময় যাব?

বিকেল চারটায় আমি ওখানে থাকব।

আনিস বলল, তাহলে তো আপনার একটা ঝামেলা শেষ হবে। আব্বাস ভাই তো কাজের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আর কোন চিন্তা নেই।

হ ভাতিজা। আল্লাহর হুকুমে কোন রকমে নিয়া যাইতে পারলেই অইল। পোলা ঠিক করাই আছে!

-৭৩-

বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে সেনবাবু একটা ছোট এপার্টমেন্ট ভাড়া নিলেন নিউইয়র্কের এষ্টোরিয়াতে। এষ্টোরিয়াতে অনেক বাঙালীর বাস। তিনি বাঙালীর কাছাকাছি, বাঙালীর সংস্পর্শে থাকতে চান। বাঙালীরাও যারা তাঁকে চেনে, যে কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেন। যাদের সাথে ভাল সম্পর্ক তাদের বাসায় যখন তখন বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটান। ঘরে যতক্ষণ থাকেন ততক্ষণ বই পড়ে বা খবররের কাগজ পড়ে সময় কাটে। দাওয়াত না পেলেও কোন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন খবরের কাগজ থেকে খবর নিয়ে।

কুদ্দুস সাহেবের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক। সময় পেলেই তিনি চলে যান কুদ্দুস সাহেবের ঔষধের দোকান জ্যাকশন হাইটস। কখনও বাসায় যান। ভবিষ্যত নিয়ে আলাপ হয়, পরামর্শ চলে। এই একাকীত্ব কতদিন চলবে, শেষ জীবনটা কিভাবে কাটবে। তিনি এখন ভেঙ্গে পড়েছেন। শারিরীক এবং মানসিকভাবে। নিজকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন।

কুদ্দুস সাহেবের ছেলে এম আই টিতে পড়াকালীন সময়েই চাকরি পেয়ে গেছে। এমআইটির ছাত্র যারা ভাল রেজাল্ট করে তাদেরকে বড় বড় কোম্পানীগুলো আগেভাগেই চাকরিতে নিয়োগ করে। সেখানে চাকুরিরর এক বছরের মাথায় সহকর্মীর সাথে তার ভাব হয়। ভাব থেকে প্রেম। প্রেম থেকে বিয়ে। মেয়েটা গায়ানীজ। লসএঞ্জেলেসে বাড়ী কিনে দু'জনেই সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে।

কুদ্দুস সাহেব বুঝতে পেরেছেন ছেলেকে কাছে পাওয়া যাবেনা কোন দিন। নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে তিনি একটা বুদ্ধি বের করেছেন। তার ভাইএর ছেলেরা লেখাপড়া করেনি। ছাত্র ভাল নয়। ভাইএর অবস্থাও ভাল নয়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টে আছেন। কুদ্দুস সাহেব তার দুই ভাতিজাকে স্পন্সর করে নিয়ে এসেছেন। তার ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছেন। থাকে তার সাথেই। তার নিজের ছেলের মত। তাদের দূরে যাবার সাম্ভাবনা নেই। কারণ তারা আর লেখাপড়া করবে না। বড় কিছু করতেও পারবেনা। এই ছেলেরা তারই সন্তান হয়ে থাকবে তাদের সাথে। একজনকে বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সেন বাবুকে নিয়ে তিনি ভাবেন। শারীরিকভাবে আরও অক্ষম হয়ে গেলে তিনি কি করবেন? দেশে ফিরে যাবারও অবস্থা নেই। সেখানে কেউ নেই। এখানেও কেউ নেই। তাহলে তার একটাই পথ আছে। সেটা হল সরকারী শেল্টারে বা হোমে চলে যাওয়া।

বৃদ্ব বয়সে দেখাশোনা করার জন্য যাদের কেউ থাকেনা তারাই আশ্রয় নেয় হোমে। সেখানে সব জাতীর সব ভাষার বৃদ্ধরা স্থান পায়। হোমের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। রুটিন অনুযায়ী পা ফেলতে হয়। নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না। না খাওয়া দাওয়ায় না চলাফেরায়। এই খোলা আকাশের নীচে, খোলাখুলিভাবে চলতে অভ্যস্ত সেন বাবু কি পাববেন হোমের নিয়ম মেনে চলতে? এ নিয়ে পরামর্শ হয় কুদ্দুস সাহেবের সাথে। তিনি স্থির করতে পারেন না কি করবেন।

-৭৪-

আজ ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৮ সাল। আনিসের মা আসছে সন্ধ্যে সাতটায়। এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এক সপ্তাহ আগে থেকেই আনিস প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমানকে বলেছে। সকাল থেকে আমানের স্ত্রী সারাদিন ধরে রান্না করেছে। সকলে মিলে এয়ারপোর্টে যাবে। মা এসে পৌঁছলেই গৃহপ্রবেশের একটা বড় অনুষ্ঠান করবে বলে আনিস স্থির করে রেখেছে। বাহারের সাথে পরামর্শ করে মেহমানের একটা লিষ্ট তৈরি করেছে বেশ আগেই। সকালে বাহার টেলিফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার মা আসছে আজ, তাই না?

হ্যা, আপনি যাবেন এয়ারপোর্টে?

হ্যা, আমি এয়ারপোর্টে যাব। কয়টায় ফ্লাইট?

সাতটায়।

আমি যাব। তবে একটু আগে। এই ধর তিনটার আগেই গিয়ে পৌঁছতে হবে বহির্গমন টার্মিনালে। তুমি অবশ্যই আসবে এই সময়ের ভেতর। বিশেষ কথা আছে।

এত আগে গিয়ে কি কথা আছে আনিস বুঝতে পারেনি। বাহারকে বলল, বাহার ভাই, শরাফত চাচাও আজ বাংলাদেশে যাচ্ছে। তাদের ফ্লাইট পাঁচটায়। আমাকে বলেছিল এক সাথে এয়ারপোর্ট যাবে। আমি তাদের সাথে যাব কথা দিয়েছি।

আরে শরাফত চাচাকে একটা কল করে বলে দিলেই হল। তিনি চলে যাবেন। বল এয়ারপোর্টেই দেখা হবে। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে। চলে এসো।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে আনিসের অনেক কথা মনে পড়ল। ছয় বছর আগে এই এয়ারপোর্টে এসে অবতরণ করেছিল। তখন তার স্বপ্ন ছিল কত উর্দ্ধে, কল্পনা ছিল দিগন্তের শেষ পাড়ে, সে উড়ছিল কোন্ কল্পলোকের আকাশে। আজ সে মর্ত্যের বাসিন্দা হয়ে, বাস্তবের মুখোমুখি দাড়িয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে অনেক। ছয় বছর আগের আনিস যেন এক নতুন আনিস হিসেবে এখানে এসেছে মাকে বরণ করতে। এও ছিল তার স্বপ্ন - মাকে রানীর আসনে বসিয়ে সুখের পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দেবে মায়ের পদতলে। মায়ের জন্য অপেক্ষা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। এবং আজই, কয়েক ঘন্টা পর। ছয় বছর আগে আনিসের জন্য কারওর অপেক্ষা করার কথা ছিল, আজ আনিস অপেক্ষা করছে।

টার্মিনালের ভেতরে ঢুকেই বাহারের সামনে পড়ে গেল। মনে হয় বাহার অপেক্ষা করছে আনিসের জন্য। একটু এগিয়ে দেখে বাহারের পরিবারের সবাই যাত্রির লাইনে দাড়িয়ে আছে। আনিস অবাক চোখে বাহারের দিকে তাকাতেই বাহার হেসে ফেলল। বলল, তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম। প্রবাস থেকে প্রবাসে! আমরা চলে যাচ্ছি কানাডায়।

এটা আর এমন কি সারপ্রাইজ? কয় দিনের জন্য যাচ্ছেন?

একবারে চলে যাচ্ছি।

কি বলেন আপনি? এটা কি জোক?

না, জোক নয়। সত্যিই যাচ্ছি।

কেন যাচ্ছেন?

তুমি ত জান না কিছুই। এখানে আমার গ্রীণ কার্ড হয়নি এখনও।

বলেন কি? আমি তো মনে করতাম আপনি এখানকার সিটিজেন! অবশ্য কোনদিন জিজ্ঞাসাও করিনি এ ব্যাপারে।

না, আমার গ্রীণ কার্ড নেই। প্রথমত: দরখাস্ত করেছিলাম স প্রগ্রামে। সেখানে মিথ্যা বলতে পারিনি বলে দরখাস্ত বাতিল। তখন বাদলকে চিনতাম না। বাদলের থিওরি ফলো করলে হয়ে যেত হয়ত। তারপর দরখাস্ত করেছি রাজনৈতিক। একেকটা তারিখ পড়ে প্রতি দু'বছর পর পর। এখনও কিছু স্থির হয়নি। মাঝখানে পেয়েছিলাম ডিভি লটারি। ইন্টারভিউতে বাদলের থিওরি অনুযায়ী অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারিনি বলে হয়নি। এখন এতদিন শুধু রাজনৈতিক দরখাস্তের নামের উপরই চলছিলাম। এই তিন রকম দরখাস্ত করে তিন রকম নাম ব্যবহার করে এমন একটা জগাখিচুরি হয়ে গেছে যে আমি কখন কোন্ নামে কোথায় কি করেছি আর মনে রাখতে পারি না। এসব দু নম্বরি কাজ পারি না। অবশ্য রাজনৈতিক দরখাস্তটা আসল নামেই করেছিলাম বলে রক্ষা। দশ বছর কেটে গেল। কিছুই হল না দেখে কানাডায় দরখাস্ত করেছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভিসার জন্য। হয়ে গেছে। এই খবর কাউকে বলিনি। কারণ অতীতে সব কটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং বিন্দুর ধারণা হয়েছে কেউ বোধ হয় আমাদের নামে ইমিগ্রেশনে কিছু লাগিয়ে দিয়েছে। যেমন কিছু বাঙালীরা এমন ঘটনা করেছে অতীতে। তাই সব কিছু গোপনে করেছি, কাউকে বলিনি। আমরা যাচ্ছি টরন্টোতে। ওখানে পৌঁছে সবাইকে খবরটা দেব। সারপ্রাইজ দেব! দশটা বছর! দশ বছর আগে এই এয়াপোর্টে যে নামটা নিয়ে নেমেছিলাম আজ দশ বছর পর সেই নামটা নিয়েই চলে যাচ্ছি। দশটা বছর জেলে ছিলাম! কেউ তো জানে না এই দশ বছর কিভাবে,

কোথায় আমার কেটেছে! একদিন বাংলাদেশটা ছেড়ে আসার জন্য হণ্যে হয়ে কত জায়গায়, কত সুযোগের সন্ধান করেছি! কোন রকমে দেশটা ছাড়তে পারলেই বোধ হয় আমার জীবনটা অন্য রকম হয়ে যাবে! তাই ছেড়ে এসেছিলাম। যতদিন সৌদি আরবে ছিলাম ততদিন বুঝিনি দেশের মায়া কত তীব্র, হারানোর বেদনা কত! কি তার দংশন! কারণ সৌদি আরবে থাকাকালীন প্রতি বছর বাড়ী যেতাম দেড় মাসের ছুটি নিয়ে। তখন কিছুই টের পাইনি। বেশ আনন্দেই ছিলাম। নিজের দেশ হারানোর অভাব এতটা ধরা পরেনি। এই আমেরিকায় এসে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে আটকে গেলাম। কাগজ না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকার বাইরে গেলে আর ফেরত আসা যাবেনা। এক বছর দু বছর করে দশটি বছর কেটে গেল। প্রতি বছরই আশায় থাকি এই বুঝি একটা কিছু হয়ে গেল। তিন বছর পর থেকেই আমার আমিকে খুঁজে পাইনা। কোথায় চলে যায়! সেই বিলের ধারে, গাঙের পাড়ে, মুড়া আর বন জঙলে। কোন সময় শহরের আনাচে কানাচে। ঝিলের ধারে যেখানে বসে আমরা আড্ডা দিতাম, বাসাবোর মাঠ, মেরাদিয়ার বিল আর সবুজ ধান ক্ষেতের আলে চলে যাই। আমি হারিয়ে যাই। আর ভাবি আমি বুঝি আর সে সব পরিবেশে ফিরে যেতে পারব না। আমি আটকে গেছি। আমার মনে হয় আমি জেলে ঢুকে আছি। আমার আসা যাওয়ার স্বাধীনতা নেই। যে আমি একদিন দেশটা ছাড়তে একটুও ব্যথা অনুভব করিনি, আনন্দে নাচতে নাচতে চলে এলাম, সেই আমি নির্জনে বসে অশ্রু লুকোই। মাঝে মাঝে আমি ফিরে যেতে চাই সব কিছু ফেলে। কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যত আর মায়া আমাকে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখে। কানাডার কাগজ হয়ে গেছে দু মাস হল। এতদিন যাইনি শুধু সাগরের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। গত কাল তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সে ভাবেই আমরা বুকিং দিয়েছি। আমার আর তর সইছে না। এক মুহূর্ত দেরী করতে পারছি না। কবে দেশে যাব! আমার অতীতকে খুঁজে বেড়াব! ফিরে যাব আমার আমাতে।

কবে যাচ্ছেন দেশে? আমান জিজ্ঞেস করল। এতক্ষন সে নীরবে শুনছিল। আর নিজেও বোধ হয় কোন কোন জায়গা ঘুরে এল মনে মনে। সেও তো বার বছর দেশে যায় না। আর এখন যাবার প্রশ্নই উঠে না। তার পরিবার চলে এসেছে। শান্তিতে আছে। কিন্তু ভেতরে জ্বলছে। নীরবে। বাহার আমানের ভেতরের সুপ্ত আগুনটা উসকে দিল। সে আনমনা হয়ে গেল।

এই তো আট তারিখে দেশে যাচ্ছি। আমার বন্ধুর মেয়ের জামাই হালিম বুকিং দিয়ে রেখেছে। আজ পাঁচ তারিখ। আর মাত্র তিন দিন। তিন দিন পর রওয়না দিয়ে চারদিন পরই পৌঁছে যাব বাংলার মাটিতে। আহ্, ভাবতেই মনে কত আনন্দ। এয়াপোর্টে নেমে আগে কি করব জান?

আনিস জিজ্ঞেস করল, কি করবেন?

বাতাস নেব। বুক ভরে, বাংলার বাতাস নিয়ে বুকটাকে জুড়াব। এক মিনিট দুমিনিট দশ মিনিট এক ঘন্টা! যদিও বায়ু আমাদের দুষিত বলে অনেকের ধারণা। এ দেশের মত নির্মল বায়ু সেবন হয়ত আমাদের হয়না। কিন্তু মনের শান্তিটাকে তো উপেক্ষা করা যায় না! আমি বুক ভরে সেই দুষিত বায়ুসেবন করব!

তারপর? আমান জিজ্ঞেস করল।

তারপর ফকিরাপুলের বাজারের পঁচা গন্ধ, থাটারি বাজারের পঁচা গন্ধ। নিউ মার্কেটের ড্রেনের গন্ধ। এগুলো শেষ হয়ে গেলে যাব গ্রামে। ঘাসের

গন্ধ, মাটির গন্ধ নেব। ধান ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে ঢেউ দেখব প্রাণ ভরে। যা এই প্রবাসে কল্পনা করা যায় না। আজ এত বছর পর বুঝতে পারলাম ওগুলোই আমার আপন। আমার শেকড়। এর টান উপেক্ষা করে এমন শক্তি নেই!

বাড়ী গাড়ী কি করলেন?

গাড়ী বিক্রি করে দিয়েছি। গতকাল হাত বদল হয়েছে। আর বাড়ী রিয়েল এস্টেটের কাছে দিয়ে দিয়েছি। বিক্রি হলে যদি পাওনা হই তাহলে হয় পাঠিয়ে দেবে নয় এসে নিয়ে যাব। এখানে আসা তো কঠিন কিছু নয়। ড্রাইভ করলে দশ ঘন্টার জার্নি। বিচিত্র দৃশ্য দেখতে দেখতে চলে আসা। ফোনে কথা বলা খুব একটা খরচ নেই। মনে কর অন্য ষ্টেটে আছি। তোমরাও যে কোন সময় বেড়াতে আসবে।

ওদিকে বিন্দু আর আমানের স্ত্রী তাদের মনের দরজা খুলে দিয়েছে। কত কথা তাদের। আনিসের মা আসার পর কি কি করনীয় সব বলে দিচ্ছে বিন্দু। এক সময় বিন্দু আনিসকে ইশারায় কাছে ডাকল। আনিস কাছে এলে বলল, তোমার আম্মা একটা জিনিষ নিয়ে আসবে। আমরা তো চলে যাচ্ছি। জিনিষটা তোমার কাছে যত্ন করে রাখবে। তোমার দায়িত্বে।

কি জিনিস সেটা?

নিয়ে আসলেই দেখবে। সাবধান, অযত্ন করবে না কিন্তু! খুব যত্ন করে রাখবে।

ঠিক এসময় তাদের লাইন এসে গেল। ওরা এগিয়ে গেল চেক-ইনের দিকে। বিন্দু বাহারকে জিজ্ঞেস করল, ওদেরকে ঠিকানা দিয়েছ?

ওখানে গিয়েই ফোনে সব দিয়ে দেব। বলে বাহার কোলাকুলি করে বিদায় নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

আমান আর আনিস নিথর দাড়িয়ে রইল। মনে হয় কেউ কাউকে চেনে না। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই, মনে মনে চলে গেছে কোন্ সুদূরে কে জানে! আনিস চলে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। হোষ্টেলে, বন্ধুদের কাছে। কেন্টিনে, লাইব্রেরিতে আরও অনেক জায়গায়। সেও দেশে যায় না আজ ছয় বছর। কবে যেতে পারবে কে জানে!

আমান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, চল যাই। কেউ দেশে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। দেশে যাবার জন্য সকলেরই মন আকুলিবিকুলি করে। যাদের গ্রীন কার্ড আছে তারাও যেতে পারে না শুধু টিকেটের কারণে। একটা টিকেটের টাকা দিয়ে বাংলাদেশে একটা পরিবারকে সাহায্য করলে তাদের বিরাট উপকার হয়। তাছাড়া অনেকেরই তেমন আয় নেই যা দিয়ে যখন তখন বাংলাদেশে যেতে পারে।

সকলের দৃষ্টি চেক ইন গেইটের দিকে। যতক্ষন দেখা গেল ততক্ষন দাড়িয়ে রইল।

আনিস বলল, চল নীচে যাই।

দোতলায় ডিপারচার টার্মিনাল। একতলায় এরাইভাল টার্মিনাল। ওরা যখন ইলেভেটরের গোড়ায় নীচে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে তখন লিফটের দরজা খুলতেই শরাফত চাচা বেরিয়ে এল। পেছনে চাচী আর তাদের মেয়ে ফাতেমা। লিফট থেকে বেরিয়ে তারা লাগেজ চেকিং লাইনে দাড়াঁল। মা মেয়ে টানাটানি করছে, আনিস আমানও হাত লাগাল। তারা যখন লাইনে সব নিয়ে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছে, তখনি একটা বাবড়ি চুলওয়ালা ছেলে এসে ফাতেমার দিকে ইশারা করল। ফাতেমা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে গেল। শরাফত চাচা আনিসকে বলল,

এই পোলাডা এই খানেও আইয়া পরছে? দেখ কি কান্ড! কি জানি কি করে! কয়েক মিনিট পর ফাতেমা ফিরে এসে বলল, আমি ওর সাথে একটু কথা বলে আসি। তারপর দুজনে হলের শেষ মাথায় চলে গেল।

আনিস জিজ্ঞেস করল, মেয়ের পাসপোর্ট কার কাছে? আর টিকেট?

পাসপোর্ট তো পুড়ির কাছেই, টিকেটটা আমার কাছে। কোন রকমে প্লেইনে উডাইতে পারলেই অইল! পুলা ঠিক কইরাই রাখছি। আমার ফুফাত ভাইর ছেলে। কলেজে পড়ে। দেখতে শুনতে খুব ভাল।

লাগেজ চেক শেষ হল। মাইকে ঘোষনা দিচ্ছে। বোর্ডিং পাশ নেবার জন্য লাইনে দাড়িয়েছে শরাফত চাচা। আনিস আমান ভাবল চাচাকে সি অফ করেই যাই। চাচার চোখ চারদিকে ফাতেমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোথায়ও চোখে পড়ছেনা। আনিসকে বলল, ভাতিজা একটু দেখ তো পুড়িডা গেল কই। তাড়াতাড়ি আইতে কও। আমান একদিকে গেল, আনিস আর দিকে। হলের এ মাথা থেকে সে মাথা। নেই। ফাতেমা নেই। কোথায়ও নেই। সেই বাবড়ি চুলওয়ালাও নেই। তারা ফিরে এসে বলল, চাচা কোথায়ও তো দেখলাম না।

মনে হল শরাফত চাচার দেহটা একবার কেপে উঠল। বলল, তাইলে আর একটু দেখি। অন্য মানুষ সব চইলা যাওক, আমরা একবারে শেষে যামু। একবারে শেষ যাত্রী এখন চাচা। আর একবার দেখা হল সমস্ত হলটা। শেষ মুহূর্তে চাচা পাসপোর্ট আর টিকেট দিল কাউন্টারে। তার চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল, বুজছি, পুড়িডা যাইবনা!

চাচীর মুখটা গোমটায় ঢাকা ছিল বলে কিছুই দেখা যায়নি। চাচা বলল, চল, আমরাই যাই। সবই গেল! মনে হল চাচার কণ্ঠ বসে গেছে! নাকি আনিসের কানের ভুল কে জানে! আনিসের দিকে না তাকিয়ে চাচা চাচিকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

চাচাকে যতক্ষন দেখা যায় ততক্ষন তারা দাড়িয়ে রইল। কে কি ভাবছে কে জানে! কার মনে এখন কি ভাবনা উথলে উঠছে সেইই জানে! চাচার সব স্বপ্ন কি এখানেই রেখে গেল!

এরাইভাল লাউঞ্জে এসে দেখে সারেং চাচা আর চাচী গেইটের এক পাশে দাঁড়িয়ে টিভিতে সময়সূচি দেখছে। কোন্ ফ্লাইট কোথা থেকে শুরু করে কখন এসে পৌঁছবে, এসব দেখছে। আনিসকে দেখে চাচা বলল, আরও বিশ মিনিট। বিমান ল্যান্ড করার পরও ইমিগ্রেশন শেষ হতে আরও ধর কম পক্ষে এক ঘন্টা। তোমরা দেরী করলে কেন?

আমরা দু'টা পরিবারকে সি অফ করে এলাম। বাহার ভাই চলে গেলেন কানাডায়।

তাই নাকি? কেন, কানাডায় কেন?

ইমিগ্রেশন নিয়ে গেছে।

তার কাগজ ছিল না এখানে?

না, স্থায়ীভাবে কিছু ছিল না।

ওটা তার জন্য ভাল হয়েছে। শান্তির দেশ। কোন মারামারি কাটাকাটি নেই। আর একজন কে?

শরাফত চাচা চলে গেলেন দেশে। আর ফিরে আসবেন বলে মনে হয় না। ছেলে মেয়েগুলোকে কন্ট্রোলে রাখতে পারেননি। মনে খুব কষ্ট নিয়ে ফিরে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন মেয়েটা সাথে যাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গেল না।

এমন অনেকেই যায়। নানা কারণে। আমি কয়েক জনকে জানি। আমাদের বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত লেখক তার স্ত্রীপুত্রকন্যা রেখে

চলে গেছে? দেশে গিয়ে খুব লেখালেখি করছেন। কেউ যায় দেশের খেদমত করার জন্য। পরের দেশে কাজ না করে নিজের দেশকে গড়ে তুলতে চায়। যেমন তোমাদের ড: জাফর ইকবাল। তিনি চলে গেছেন দেশের কাজ করবেন বলে। কেউ গেছে দেশেই ভাল থাকবে এই ভেবে। কেউ যায় এখানে ছেলেমেয়েদের উপর ভরসা করতে পারেন না বলে। তারা মনে করেন বৃদ্ধ বয়সে সন্তান তাদের দেখাশুনা না করলে এখানে থেকে লাভ কি? এটা ভুল ধরাণা। কে কার বৃদ্ধ মাতাপিতাকে সেবা করতে পারে? এই ধর সেন বাবুর কথা। তাঁর ছেলেমেয়েরা যার যার কাজে ব্যস্ত। জীবনের প্রয়োজনে দূরে থাকতে হচ্ছে। সেনবাবু এখন একা। কেউ নেই তাঁর দেখাশুনা করার। এটাইতো স্বাভাবিক। সেন বাবু নিজেও কি পেরেছেন তার মাতাপিতার সেবা করতে? তোমার শরাফত চাচা থেকে গেলেই পারতেন! তাদের চলে যাওয়ায় ছেলেমেয়েগুলো আরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে তোমার শরাফত চাচাকে ফিরে আসতেই হবে। তারাও থাকতে পারবে না।

সকলের দৃষ্টি সময়সূচির টিভির দিকে। বিমান ল্যান্ড করেছে। এবার দেখা দেবার পালা। আনিসের বুক দুরু দুরু করছে। কতদিন পর মা'কে দেখবে! এই ছয় বছরে মা কেমন হয়েছে দেখতে! নিশ্চয়ই আরও বুড়িয়ে গেছে। মা'কে আর একা থাকতে দেবে না সে। যেখানেই যাবে মা'কে সাথে নিয়ে যাবে। এতদিনের হারানো সময়টা পুষিয়ে নিতে হবে। সব সময় কাছে থাকবে। মা যা চায় তাই দেবে। চাচাকে বলেছিল তার বাড়ীতে চলে আসার জন্য। মা খুশি থাকবে। চাচা বলেছেন চাচীকে ছেড়ে থাকাটা সম্ভব নয়। তারও একজন সাথীর প্রয়োজন। এই বৃদ্ধ বয়সে সাথী না থাকলে সময় কাটে না। মা তাঁর মুরুব্বী। সাথী হতে পারেনা। তবে চাচা প্রতিদিন একবার করে এসে মা"কে দেখে যাবেন।

যাত্রী বের হচ্ছে। একজন দু'জন করে। লম্বা লাইন। ওই পেছনে শেষের দিকে দেখা যায় মায়ের মত একজন। আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। হ্যাঁ, এখন পরিষ্কার চিনা যাচ্ছে। মা। মা'র পেছনে এক মহিলা। দেখতে লতা ভাবীর মত! আরও কাছে এল। হ্যাঁ, লতা ভাবীও তাহলে একই ফ্লাইটে ফিরে এল! আমানকে বলল, দেখ লতা ভাবী বুদ্ধি করে একই ফ্লাইটে এসেছে। জানে মায়ের জীবনে এই প্রথম বিমানে ভ্রমন। ভাবী সাথে থাকাতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হয়নি।

চাচা বলল, তাহলে তারা পরামর্শ করেই এক সাথে এসেছে। এটা খুবই ভাল হয়েছে। তোমার মা একা এলে অনেক কষ্ট হত। এই মেয়েটা আসলে খুব কাজের, অনেক বুদ্ধি রাখে। সৈয়দের বাসায় যখনই গেছি তার আপ্যায়নের কোন ত্রুটি দেখিনি। আমাকে সে তার আপন চাচার মত দেখে। আমার খুব ভাল লাগে মেয়েটাকে।

আনিস চারদিক তাকিয়ে দেখল সৈয়দকে কোথায়ও দেখা যায় কিনা। কোথায়ও না দেখে আমানকে বলল, আমান দেখ তো সৈয়দ সাহেব এসেছে কিনা। যদি না এসে থাকে তাহলে ভাবীকে তো তার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে। আমান কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বলল, না, কোথায়ও দেখলাম না।

শেষ কাউন্টার পেরিয়ে তারা বেরিয়ে এল। আনিসের মা আগে, তার পেছনে লতা। লতার এক হাতে ধরা শান্ত। সামনে আসতেই আনিস ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের বুকে। আর সাথে সাথে আনিসকে জড়িয়ে ধরল শান্ত। আঙ্কেল! আমি এসে গেছি! অনেকক্ষন। কেউ কোন কথা বলল না। লতা নির্বাক দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে এই মিলনোৎসব। 'ভরা থাক স্মৃতি....মিলনের উৎসবে তা ফিরায়ে দিও আনি'! আনিসের এক হাত

মায়ের গলায়, আর এক হাত শান্তর পিঠে। আনিসকে বুকে জড়িয়ে ধরেই তার মা সারেং চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বউ কোথায়?

এই যে আমার কালোবরণ বউ।

সুসান হাত তুলে সালাম বিনিময় করল।

মায়ের আবার প্রশ্ন: বিন্দুটা কে? আসেনি এখানে?

না, ওরা কানাডায় চলে গেছে।, আমান বলল।

আমাকে আনতে বলে সে চলে গেল কানাডায়!

এসময় মা'কে ছেড়ে আনিস লতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন ভাবী?

কে কার ভাবী? আমি আর কারও ভাবী নই। আমার নিজের একটা নাম আছে। আমার নাম ধরে ডাকলেই খুশি হব।

লং জার্নিতে মেজাজটা দেখি তিরিক্ষি হয়ে আছে! ব্যাপার কি! আপনি আসবেন, সৈয়দ সাহেব জানে না? তাকে তো দেখলাম না!

আনিসের মা আনিসকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এখানে আর কোন কথা নয়। আগে বাসায় চল, সব বলব। লতাকে আমি নিয়ে এসেছি, লতা আমার সাথে যাবে। এই বলে তিনি খুব শক্ত করে লতার হাত ধরে এগিয়ে গেলেন।

সমাপ্ত

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

ড: খন্দকার আলমগীর
বামনদাস বসু
মাহফুজ চৌধুরী
ড: আবদুল মোমেন
ড: জ্যোতি প্রকাশ দত্ত
হামিদ রেজা খান
ড: রণজিত কুমার দত্ত
সৈয়দ মুহাম্মদউল্লাহ
জাহাঙ্গির আলম
আ,স,ম,জিয়াউদ্দিন
মাহফুজুল বারী
ড: ওসমান গনী
এ,এফ,এম,আলিমুজ্জামান